Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পশ্চিমা সভ্যতা না ইসলামি সভ্যতা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়েশা আক্তার

রোলঃ 227020847

২৯ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পশ্চিমা সভ্যতা না ইসলামি সভ্যতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়েশা আক্তার

রোলঃ 227020847

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পশ্চিমা সভ্যতা না ইসলামি সভ্যতা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আয়েশা আক্তার, আইডিঃ 227020847 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওঃ আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পশ্চিমা সভ্যতা না ইসলামি সভ্যতা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

আয়েশা আক্তার

আইডিঃ 227020847

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১ 6

সভ্যতার পরিচয় 6

মিশরীয় সভ্যতা 6

গ্রিক সভ্যতা 6

রোমান সভ্যতা..7

অধ্যায় ২ 8

পশ্চাত্য সভ্যতার পরিচয় 8

যেভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো...8

অধ্যায় ৩ 9

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিভিন্ন দিক 9

বিশ্বাস...9

রাষ্ট্রব্যবস্থা 10

সমাজব্যবস্থা... 11

পারিবারিক অবস্থা 12

নারীর অবস্থান.. 12

বিশ্বব্যাপি পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তার 13

অধ্যায় ৪... 15

ইসলামি সভ্যতার পরিচয়... 15

ইসলামি সভ্যতার বিভিন্ন দিক 15

বিশ্বাস.. 15

রাষ্ট্র ব্যবস্থা.. 15

সমাজব্যবস্থা... 16

নারীর অবস্থান 16
ইসলামি সভ্যতার প্রসার 18
ইসলামি সভ্যতায় জ্ঞান চর্চা 19
ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি 20
অধ্যায় ৫ 22
ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব 22
ইসলামি সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্বের কারন 23
মুসলিম দেশ গুলো কেনো পাশ্চ্যাত্য সভ্যতা কে গ্রহন করছে? 24
অধ্যায় ৬ 27
সভ্যতা অনুসরন 27
আমি কেন ইসলামি সভ্যতা গ্রহন করবো? 27

অধ্যায় ১

সভ্যতার পরিচয়

সভ্যতা বলতে অনেকে বস্তুগত উৎকর্ষতাকে বুঝিয়েছেন। এ অর্থে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সব বস্তুগত আবিষ্কারের ফলকে একত্রে সভ্যতা বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার কারিগরি কলা কৌশল ও বাস্তব যন্ত্রপাতিও এর অন্তভূর্ক্ত। সভ্যতা বলতে আমরা বুঝি মানুষ তার জীবনধারেণের জন্য যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সংগঠন সৃষ্টি করেছে তারই সামগ্রিক রুপ। পৃথিবীতে বিভিন্ন সভ্যতার উথ্যানঃ

মিশরীয় সভ্যতা

- বুক অফ ডেথ মিশরীয় সভ্যতার সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন।
- মিশরীয় সভ্যতার লিখনপদ্ধতির নাম হায়ারোগ্লিফিক।
- ৪২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দতে তারা প্রথম সৌর পঞ্জিকা আবিষ্কার করে। অর্থাৎ,তারা ১২ মাসে ১ বছর, ৩০ দিনে ১ মাস এই জাতীয় গণনারীতি চালু করে। ৩৬৫ দিনের হিসাবও তারাই প্রথম ব্যবহার করে।

গ্রিক সভ্যতা

- সক্রেটিস> প্লেটো> আরিস্টোটল> আলেকজান্ডার।
- অলিম্পিক খেলার জন্ম প্রাচীন গ্রিসের অলিম্পিয়া নামক স্থানে।
- ইতিহাস রচনার সূত্রপাত করেছিল গ্রিকরা।
- ইতিহাসের জনক গ্রিক দার্শনিক হিরোডোটাস।
- গ্রিকদের ১২জন দেবদেবী ছিল। দেবতাদের রাজা ছিলেন জিউস। অ্যাপোলো ছিলেন সূর্যের দেবতা,পোসিডন ছিলেন সাগরের দেবতা, এথেনা ছিলেন জ্ঞানের দেবী।

রোমান সভ্যতা

- ❖ রোম নগরীর উদ্ভব ৭৫৩ খ্রিস্টপূর্বে। টাইবার নদীর তীরে অবস্থিত রোম শহর।
- ❖ রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে-৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে।
- ❖ রোম নগরীকে Roma Aeterna (শাশ্বত শহর) এবং caput Mundi (বিশ্বের রাজধানী) হিসেবে গণ্য করা হয়, প্রাচীন রোমান সংস্কৃতি দুইটি কেন্দ্রীয় ধারনা।
- ❖ সম্রাট কন্সটান্টাইন এর আমলে রোমান সাম্রাজ্য একটি খ্রিস্টধর্মীয় সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।

অধ্যায় ২

পশ্চাত্য সভ্যতার পরিচয়

যেভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো

আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কেন্দ্র হলো ইউরোপ। বলা হয়, রোমান ও গ্রিক সভ্যতা থেকেই পশ্চিমা সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ প্রাচীন গ্রিক, রোমান এবং অন্যান্য ইউরোপিয়ান জাতিগুলোর মাঝে যে পৌত্তলিক চেতনা বিদ্যমান ছিল, তার প্রমাণ এখনো পশ্চিমা সভ্যতার মধ্যে খুজে পাওয়া যায়; যদিও তাদের জীবনধারায় ধর্মীয় অনুশাসন নেই বললেই চলে। যেমন প্রতিটি দিনের নামের কথাই ধরুন। প্রতিটি দেশেরিই নিজ ভাষায় সপ্তাহের প্রতিটি দিনের নাম আছে, তবে ইংরেজি নামগুলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এগুলোর সঙ্গে পৌত্তলিকতার রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। রোমানরা যে দিনে যে গ্রহের উপাসনা করতে সে দিনের নাম রাখা হয়েছে। সে দেবতার নামের সাথে মিলিয়ে। শনিবারের কথাই ধরুন; শনিবার বা Saturday শব্দটির উৎপত্তি প্রাচীন ইংরেজি শব্দ Saeterndaeg থেকে যার অর্থ হচ্ছে শনি বা Sateren এর দিবস। রবিবার বা Sunday এসেছে প্রাচীন ইংরেজিজ শব্দ Sunnndaeg থেকে, যার অর্থ হলো সূর্য দিবস আর সোমবার বা Monday এর উৎপত্তি হলো ইংরেজি শব্দ Monandaeg থেকে।

এখানেই শেষ নয়, বরং পশ্চিমা সভ্যতার মূলের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় তাদের আরেকটি পরিচয়। আর তা হলো- এটি একটি ইহুদি খ্রিষ্টানভিত্তিক সংস্কৃতি ও সভ্যতা। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ছিলেন ইহুদিদের মাঝে ইনজিল কিতাব নিয়ে প্রেরিত একজন নবি। খ্রিষ্টানরা বাংলায় তাকে যিশুখ্রিষ্ট বলে থাকে, আর ইংরেজিতে বলে Jisus । কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালাম যে শিক্ষা দীক্ষা দিয়েছিলেন কালের আবর্তনে তার প্রকৃত শিক্ষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তৎকালীন রোমান এবং গ্রিক দেবতাদের আকৃতি ছিল মানুষের মতো। তাদের ব্যাপারে এ ধারণা প্রচলিত ছিল যে, তারাও মানুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। এমনকি তাদের মিলনে জন্ম নেয় অর্ধদেবতা বা হাফ গড। কী অদ্ভুত ধারণা তাদের! কেমন অর্থব সভ্যতা।

অধ্যায় ৩

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিভিন্ন দিক

বিশ্বাস

ডারউইনের বিবর্তনবাদ এবং মার্ক্সের দ্বান্দিক বস্তুবাদ- উভয়টিই মানবজাতির অস্তিত্বে আসার ব্যাপারটি নিছক প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া বিক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছে। মানুষের জীবনপ্রবাহের গতিপ্রকৃতি ও পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছে আর্থ সামাজিক দ্বন্দের প্রেক্ষাপট থেকে । অতিপ্রাকৃত কোনো শক্তির সাহায্য ছাড়াই সম্পূর্ণ বস্তবাদের আলোকে এই দুটো তত্ত্ব মানুষের জীবনের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করেছে।

ডারউইন মনে করতেন, সাদা চামড়ার ইউরোপিয়ানরা অন্যদের তুলনায় বেশি উন্নত। কারণ, তার তো ধারণা ছিল, বানর সদৃশ কোনো প্রাণীর থেকে বিবর্তন হতে হতে মনুষ্য জাতির জন্ম, তথাপি তিনি মনে করতেন, মানুষের মধ্যেই আবার কিছু কিছু নরগোষ্ঠীর বিবর্তন অন্যদের তুলনায় বেশি সংগঠিত হয়েছে। তাই তারা অন্যদের থেকে উন্নত। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, অপেক্ষাকৃত স্বল্প বিবর্তিত নরগোষ্ঠীর মধ্যে বানরের বৈশিষ্ট্য অধিকতর বিদ্যমান। ডারউইন তার The Decent of Man বইয়ে (এটি প্রকাশিত হয়েছিল The Origin of Species এর পরে) সাদা কালো বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর মধ্যে বিবর্তনের তারতম্যের কারণে সৃষ্ট পার্থক্যগুলো নিয়ে বেশ জোরালো আলোচনা করেছেন- ‘কালো চামড়ার মানুষেরা নিম্নজাত এবং তুলনামুলক কম বিবর্তিত বিধায় অনুন্নত’। খ্রিষ্টধর্মের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের বিরোধ যখন চরমে পৌছে তখন দার্শনিক Hume দাবি করেন যে, বস্তুর ঊর্ধ্বে আর কিছু নেই। যদি থাকেও তা আমাদের প্রয়োজনে আসে না। এ মতবাদকেই Materialism বা বস্তুবাদ বা জড়বাদ বলা হয়। Hume এ মনোভাবটিকে দার্শনিকতার রুপ দান করে দাবি করেন যে, বস্তুর বাইরের কোনো কিছুকে বিশ্বাস ও স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, সেসব মানুষের বাস্তব জীবনে কাজে আসে না। তাই বস্তুবাদে যারা বিশ্বাসী তাদের নিকট আল্লাহ, রাসুল, ওহি, পরকাল ইত্যাদি নিছক অন্ধবিশ্বাস ও

কুসংস্কারমাত্র। আধুনিক মতবাদ হিসেবে বস্তুবাদ পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যতম ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে এ মতবাদ চরম জাহেলিয়াত। এ মতবাদকে সত্য বলে স্বীকার করলে মানুষের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়। অথচ ইসলামের বক্তব্য হলো, মানবদেহে বস্তুগত সত্তা হলেও আসল মানুষটি বস্তু নয়, বরং তা রুহ। সুতরাং ভালো ও মন্দের বিচারবোধ বা বিবেকের অস্তিত্বকে কেমন করে অস্বীকার করা যায়? বিবেককে জড় পদার্থ বলে দাবি করার কী যুক্তি থাকতে পারে?

রাষ্ট্রব্যবস্থা

পশ্চিমা সভ্যতার মূলভিত্তি হলো সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা হলো সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মের পৃথকীকরণ বা শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মচর্চার অনুমোদন দেওয়া। তারা মনে করে সেক্যুলারিজম থেকে উদ্ভূত তাদের জীবনব্যবস্থা ও আদর্শ গোটা বিশ্বের মেনে নেওয়া উচিত। অথচ সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা হলো এমন এক সামগ্রিক বিশ্বাস যা সমাজ ও রাষ্ট্রে ধর্মের চর্চাকে প্রত্যাখ্যান করে, শুধু ব্যক্তিগত ধর্মীয় ইবাদতের অনুমোদন করে। এ মতবাদ অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের কোনো প্রভাব গ্রহণযোগ্য নয়; নাগরিক নীতিমালা প্রণয়ন ও জাতীয় কর্মকান্ডের ধর্মীয় মূল্যবোধের কোনো প্রভাব থাকতে পারে না। অথচ ইসলাম যেমনিভাবে ব্যক্তিগত ইবাদতের ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়, অনুরুপ সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারেও নির্দেশনা দেয়। কেননা ইসলাম হলো একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা আছে। এসব নির্দেশনা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মানা ফরজ। তাই সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার মতবাদ সম্পূর্ণ কুফরি মতবাদ।

ইসলামি সভ্যতা যে ভিত্তির উপর দাড়িয়ে আছে, ধর্মনিরপেক্ষতা তার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। ইসলামি সমাজের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে একজন মুসলিমের ধর্মবিশ্বাস ও তার ইবাদত। একটি ইসলামি সমাজ মানেই হলো মুসলিমদের ধর্মবিশ্বাস এবং কর্মের প্রতিচ্ছবি। ইসলামি শরিয়াহ আইনের ভিত্তিতেই মুসলিম

জাতির শিক্ষাব্যবস্থা এবং নাগরিকনীতি পরিচালিত হবে। আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধান দিয়ে বিচার ফায়সালা করা একটি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ এবং কুফর হিসেবে বিবেচিত। এই মূলনীতিটি পরিষ্কারভাবে কুরআনে উল্লেখ আছে- যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।

সমাজব্যবস্থা

পৃথিবীতে যত দিন ইসলামি সভ্যতার নেতৃত্ব চালু ছিল তত দিন মানবজাতির জীবনে তেমন কোনো বিপর্যয় দেখা দেয়নি। কারণ, ইসলামের নৈতিকক মূল্যবোধ তাদের অমানবিক কাজ থেকে বিরত রাখত। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাধান্য কায়েম হওয়ার পরও মানবজাতি মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। কারণ, তারা Divine Guidance- এর ধার ধারে না বলে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি অনুযায়ী যে দেশই দখল করছে সেখানে জনগণকে ভয়ংকর নির্যাতন করেছে। বর্তমানে ইরাক ও আফগানিস্তান এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিকেক অন্যান্য দেশকে পরাধীন করে রাখার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। বিশ্বকে বিজ্ঞানের উন্নতির ফসল ও উন্নত প্রযুক্তি তারা অবশ্যই দিয়েছে, কিন্তু এসব কি মানবতার কল্যাণে লেগেছে?

প্রসঙ্গত একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। উদাহরণটি এমন- একই মানের ইস্পাত দিয়ে দুটি ছুরি তৈরি করা হলো। একটি ছুরি সিভিল সার্জনের হাতে গেল, অপরটি ছিনতাইকারী বা ডাকাতের হাতে পড়ল। একই মানের ছুরি বটে, কিন্তু ব্যবহারকারী একই মানের নয়। একজনের ছুরি জীবন রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, আরেকজনেরটা জীবন হরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। এখানে ছুরির কোনো দোষ নেই, বরং ছুরি মন্দ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করাটাই অপরাধ, ছুরি অপরাধী নয়। মার্কিন এই লেখক পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাবকে হেরোইনের ভয়াবহ প্রভাবের সাথে তুলনা করেছেন। হেরোইন যেমন প্রথমে মানুষকে দৃশ্যত প্রশান্তি দিলেও ক্রমেই মানবদেহকে বিকল করে দিয়ে মাদকসেবীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, তেমনই পশ্চিমা সভ্যতাও বাহ্যত আকর্ষণীয় হলেও এর চূড়ান্ত ফল বিষময়।

পারিবারিক অবস্থা

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবার হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। সভ্যতা নির্মাণে পরিবারের অবদানই সবচেয়ে বেশি। মার্তগর্ভে জন্ম নিলেই একটি শিশু মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠে না। মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার জন্য তাকে মূল প্রশিক্ষণ দেয় তার পরিবার। কাজেই একটি সভ্যতা নির্মাণের জন্য পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, পাশ্চাত্যে মানবইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন এ প্রতিষ্ঠানটি আজ বিপর্যয়ের মুখে। পরিবারই যে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়, সে কথাটি যেন পাশ্চাত্যের সরকার ও নীতি নির্ধারকরা ভুলতেই বসেছেন। পরিবার যে উচ্চতর এক উদ্দেশ্যেকে সামনে রেখে গড়ে ওঠে, তারা পরোক্ষভাবে তা অস্বীকার করছেন। মনে রাখা দরকার, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যৌনতাই পরিবারের সবকিছু নয়। পরিবার প্রথা ব্যক্তির পাশাপাশি সমাজ এবং রাষ্ট্রে শান্তি নিশ্চিত করে। কিন্তু পাশ্চাত্যে যৌনতাকে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হচ্ছে। সব কিছুর ওপর যৌনতা প্রধান্য পেলে মানুষস আর পশুর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর জীব হিসেবে মর্যাদা পাওয়ার অধিকার রাখে না। মূলত সুস্থ ও সমৃদ্ধ পরিবার একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ সমাজ ও সভ্যতার জন্ম দেয়। অপরদিকে পারিবারিক বিপর্যয় সভ্যতা ধ্বংসের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতে পারে।

নারীর অবস্থান

পশ্চিমাদের কাছে নারী কেবল ভোগের বস্তু বৈ কিছুই নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে এক শ্রেণির জ্ঞানপাপীরা এ কথা বলে বেড়াচ্ছে যে, ইসলাম নারীদের পর্দার বেষ্টনীতে আটকে রেখে তাদের কেবল ভোগের বস্তু বানাতে চায়। সুতরাং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামি সভ্যতার নারীর অবস্থানটা একটু তুলে ধরার চেষ্টা করছি। সেই সাথে ইসলামপূর্বে যুগে নারীর অবস্থা ও বর্তমানে অন্যান্য ধর্মে বা সমাজে নারীর অবস্থানও তুলে ধরছি।

হিন্দুস্থানের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ‘মনু সংহিতা’য় পিতা, স্বামী কিংবা দুজনের মৃত্যুর পর পুত্রহীন নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত কোনো অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। আর পিতা, স্বামী ও পুত্র; এই তিন জন মারা গেলে তাকে তার স্বামীর কোনো এক পুরুষ আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে থাকা আবশ্যক ছিল। সে কোনো অবস্থাতেই তার নিজের ব্যাপারে স্বাধীন ছিল না। জীবিকার ক্ষেত্রে তার অধিকার বঞ্চনার চাইতেও বেশি নির্মম ছিল স্বামীর বিয়োগপরবর্তী জীবনে বেঁচে থাকার অধিকারের সামাজিক অস্বীকৃতি। সমাজ মনে করত স্বামীর মৃত্যুর পর তার আর বেচেঁ থাকার অধিকার নেই। যার ফলে স্বামীর মৃত্যুর দিন সতীদাহ’ই (স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মরা) ছিল এমন নারীর অবধারিত নিয়তি। এই প্রাচীন রীতি ব্রাক্ষণ্য সভ্যতার সেই আদিকাল থেকে ১৭ শতক পর্যন্ত বহাল ছিল। এরপর বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের আপত্তির মুখে এর বিলুপ্তির ঘটে। চীনে নারীদের সম্পর্কে ধারণা হলো, তাদের মধ্যে শয়তানের প্রেতাত্মা থাকে। ফলে নারীই হলো সমাজের যত অনিষ্ঠ ও বিশৃঙ্খলার একমাত্র ভিত্তি। খ্রিষ্টবাদ বৈরাগ্যতার আবিষ্কার করেছে। ফলে তাদের আলিমদের মত হলো, দাম্পত্যজীবন আল্লাহর মারিফত তথা পরিচয় লাভের প্রতিবন্ধক। সুতরাং তাদের শিক্ষা হলো, পুরুষরা পুরোহিত হয়ে থাকবে আর নারীরা নান হয়ে থাকবে। নারী পুরুষ সকলেই একাকী জীবনযাপন করবে, তাহলেই আল্লাহর মারিফাত লাভ করা সম্ভব হবে। তারা দাম্পত্যজীবনকে এর জন্য প্রতিবন্ধক মনে করে থাকে।

বিশ্বব্যাপি পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তার

বর্তমানে গোটা বিশ্বে পাশ্চাত্য সভ্যতা তথা ইউরোপ, আমেরিকার জয়জয়কার। বিশ্বব্যাপী তাদের সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ইউরোপিয়ান ঔপনিবেশিক শাসনামলে; বর্তমানে নব্য সাম্রাজ্যবাদের যুগেও পরোক্ষ শাসন হিসেবে টিকে আছে।

মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে প্রায় সকল দেশেই পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব আজ প্রবল। বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে এই সংঘাত একটি অনিবার্য স্বাভাবিক পরিণতি। কারণ, পাশ্চাত্য কিংবা প্রাচ্য সবখানেই সংস্কৃতি এমনই একটি বিষয়, যা তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতিসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপক স্যামুয়েল পি হান্টিংটন The Clash of Civilization গ্রন্থে ইসলামের সঙ্গে পশ্চিম সভ্যতার সংঘাত এভাবে তুলে ধরেছেন-

ইসলামি মৌলবাদ পশ্চিমাদের জন্য মূল সমস্যা নয়; বরং সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন সভ্যতার ধারক হওয়ার কারণে খোদ ইসলামই তাদের মূল সমস্যা। কারণ, এ ধর্মের অনুসারীরা তাদের নিজেদের জীবনাচার ও ইসলামের সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে; যদিও নিজেদের শক্তি সামর্থ্যের দীনতা বর্তমানে তাদের মনকে কিছুটা দুর্বল করে রেখেছে। একই ভাবে ইসরামের জন্য সিআইএ কিংবা আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কোনো সমস্যা নয়, বরং পুরো পশ্চিমা সভ্যতাই তাদের জন্য একটি বড় সমস্যা। কারণ, তারাও বিশ্বাস করে যে, তাদের জীবনধারা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশ্বজনীন। এমনকি তারা এ-ও বিশ্বাস করে যে, শক্তি প্রয়োগ করে হলেও গোটা বিশ্বের মানুষকে আমাদের সভ্যতা মেনে নিতে বাধ্য করা উচিত। ইসলাম এবং পশ্চিমা বিশ্বের এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের পেছনের এটাই হলো মূল কারণ।

নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার একটি প্রবন্ধে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে- বিশ্বশান্তি এবং নিরাপত্তার প্রধান হুমকি হিসেবে দৃশ্যপটে মুসলিম মৌলবাদকে আবির্ভূত হচ্ছে বেপরোয়াভাবো। শুধু তাই নয়, বরং তা জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে নানা প্রকার গোলযোগ সৃষ্টি করছে। ১৯৩০ এর দশকে নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদ এবং পরবর্তীকালে পঞ্চাশের দশকে সমাজতন্ত্র যে ভীতিকর অবস্থার জন্ম দিয়েছিল, ইসলামি মৌলবাদের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে। তবে অধ্যাপক হান্টিংটন এসব দাবিকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়ে গোটা ইসলামকেই পশ্চিমাদের জন্য সমস্যার মূল কারণ চিহ্নিত করেছেন। কেননা ইসলামি সভ্যতা মৌলিকভাবে পশ্চিমা সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী।

অধ্যায় ৪

ইসলামি সভ্যতার পরিচয়

ইসলামি সভ্যতার বিভিন্ন দিক

বিশ্বাস

ইসলাম তার অনুসারীদের ইসলামি সভ্যতার যে ভিত্তি প্রদান করেছে, যারা তা মেনে চলে তাদের চরিত্রে নিম্নরুপ গুণাবলি দেখা যায়-

- ❖ তারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করে, আখিরাতে আল্লাহর নিকট দুনিয়ার কৃত যাবতীয় কর্মের হিসাব দিতে হবে বলে সর্বদা সর্তক হয়ে জীবনযাপন করে।
- ❖ তারা অবৈধ ও অনৈতিক উপায়ে সম্পদ হাসিলের চেষ্টা করে না। কারও সাথে প্রতারণা করে না। তবে এক-দুজন পাপাচারী থাকবে- এ কথা ভুলে গেলে চলবে না। তদ্রুপ এটিকে মৌলিক বিষয় হিসেবে গণ্যও করা যাবে না।
- ❖ কারও উপর তারা সামান্য অন্যায় করে না।
- ❖ নিজের স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারীদের সাথে তারা যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে না। এমনকি পরনারীর প্রতি কুদৃষ্টিও দেয় না।
- ❖ ইসলাম দুনিয়াকে ভোগ করার যতটুকু অধিকার দিয়েছে এবং যে নিয়মে ভোগ করার অনুমতি আছে, একমাত্র ততটুকুই নির্ধারিত নিয়মে তারা ভোগ করে। তারা বৈরাগ্য অবলম্বনন করে না। এমনকি ভোগবাদীদের মতো লাগামহীনও হয় না ইত্যাদি।

রাষ্ট্র ব্যবস্থা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি দেশে ইসলামি জীবনবিধান জনগণের নিকট পেশ করেন, যে দেশে সেকালের সভ্য দুনিয়ার (রোম ও পারস্য সভ্যতা) কোনো আলো পৌছেনি। সভ্য দুনিয়া তাদের বর্বর জাতি বলেই মনে করত। তারা বংশানুক্রমিকভাবে গোত্রে গোত্রে মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানিতে লিপ্ত ছিল। লেখাপড়ার চর্চা ছিল না বললেই চলে। জনগণের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত ছিল

না। কারণ, দেশে কোনো একক সরকারের অস্তিত্বই ছিল না। এমন একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামি শিক্ষা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালো মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে গোটা আরবে এমন একটি আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, যা মানবজাতির ইতিহাসে সেরা কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত। এ কারণে মাইকেল হার্ট তার লেখা 'দি হানড্রেড' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে মানবজাতির ইতিহাস থেকে বাছাই করা ১০০ জন মনীষীর মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন।

সমাজব্যবস্থা

ইসলাম ধর্ম, ব্যক্তি স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার পক্ষে। সমাজে কুপ্রথা ছড়িয়ে দেওয়ার অধিকার কোনো ব্যক্তির নেই বলে ঘোষণা করেছে ইসলাম। ধর্ম মতে, স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ ও সহযোগিতার মধ্য দিয়েই দাম্পত্য জীবন সুখী ও সমৃদ্ধ হয়। স্বামীর উপর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণ পোষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

নারীর অবস্থান

আরবে ইসলাম আগমনের পূর্বে নারীদের অধিকার এমনভাবে পদদলিত করা হতো যে, মানুষ নিজের ঘরে কন্যাসন্তানের জীবন্ত পুতে ফেলত। নারীদের অধিকার এ পরিমাণে ভূলুণ্ঠিত ছিল যে, কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথে তার সহায় সম্পত্তি যেমনিভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র আপন মাতাকে স্ত্রীতে পরিণত করত। এমনই এক সময়ে রহমতের নবি রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরার বুকে আগমন করে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন- হে লোকসকল, নারী যখন কন্যা, তখন সে তোমার মর্যাদা ও পবিত্রতা। নারী যখন স্ত্রী, তখন সে তোমার জীবনসঙ্গিনী। নারী যখন মাতা, তখন তার পদতলে তোমার জান্নাত।

তিনি আরও বলেন- যে ব্যক্তির দুটি কন্যাসন্তান আছে, সে যদি তাদের উত্তম শিক্ষা দান করে ও তাদের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে, তাহলে সে জান্নাতে আমার এত

নিকটবর্তী হবে, যেমন হাতের দুটি আঙ্গুল পরস্পর নিকটবর্তী। সুতরাং কন্যাসন্তান জন্মের দ্বারা যেন জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত হওয়ার সুসংবাদ রয়েছে।
তিনি আরও বলেন- যে ব্যক্তির দুটি কন্যাসন্তান আছে, সে যদি তাদের উত্তম শিক্ষা দান করে ও তাদের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করের, তাহলে সে জান্নাতে আমার এত নিকটবর্তী হবে, যেমন হাতের দুটি আঙ্গুল পরস্পর নিকটবর্তী সুতরাং কন্যাসন্তান জন্মের দ্বারা যেন জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত হওয়ার সুসংবাদকে রয়েছে। সুতরাং কোনো সংকোচ ছাড়াই এ কথা বলা যায় যে, ইসলাম কস্মিনকালেও নারীকে ভোগের সামগ্রী মনে করে না। এর আরও প্রমাণ হলো- ১। ইসলামে নারীকে সম্মানজনক মোহর প্রদানের মাধ্যমে বিয়ে করতে হয়। ২। নারীর সারা জীবনের ভরণ পোষণের দায়িত্ব পুরুষের কাধে তুলে নিতে হবে। তা ছাড়া আল্লাহ সুবহানাল্লাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন-

তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো। অতঃপর যদি তাদের অপছন্দ করো, তাহলে তোমরা এমন বস্তুকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন। হাদিস শরিফে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেন-
“তোমাদের পরিবারের নিকট উত্তম ব্যক্তিই হলো প্রকৃত উত্তম ব্যক্তি।”

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে ইরশাদ করেন-
“আমি আমার পরিবারের নিকট উত্তম?”

সুতরাং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জীবনকে উদাহরণ ও আদর্শ হিসেবে তুলে ধরে বলেন, কোনো ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব যাচাই করতে হলে তার বন্ধু-বান্ধব থেকে জিজ্ঞাসা না করে, তার ব্যবসা বাণিজ্যের তদারকি না করে, তার স্ত্রীর নিকট জানতে চাও, ব্যক্তি হিসেবে সে কোন পর্যায়ের? স্ত্রী যদি সাক্ষ্য দেয়, আচরণে সে একজন উত্তম ব্যক্তি, তাহলেই সে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেন- (বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার!) তোমাদের মধ্যে কেউ স্ত্রীকে দাস-দাসীর মতো প্রহার করে, এরপর তার সাথে আবার আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে লজ্জাবোধ করে না! সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা

নারীদের হারানো মর্যাদা ও অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। সেই সাথে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, নারী কি ইসলামি সভ্যতায় ভোগের বস্তু না কি পাশ্চাত্য সভ্যতায়?

ইসলামি সভ্যতার প্রসার

বর্তমানে গোটা বিশ্বে পাশ্চাত্য সভ্যতা তথা ইউরোপ, আমেরিকার জয়জয়কার। বিশ্বব্যাপী তাদের সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ইউরোপিয়ান ঔপনিবেশিক শাসনামলে; বর্তমানে নব্য সাম্রাজ্যবাদের যুগেও পরোক্ষ শাসন হিসেবে টিকে আছে।

মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে প্রায় সকল দেশেই পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব আজ প্রবল। বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে এই সংঘাত একটি অনিবার্য স্বাভাবিক পরিণতি। কারণ, পাশ্চাত্য কিংবা প্রাচ্য সবখানেই সংস্কৃতি এমনই একটি বিষয়, যা তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতিসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যামুয়েল পি হান্টিংটন The Clash of Civilization গ্রন্থে ইসলামের সঙ্গে পশ্চিম সভ্যতার সংঘাত এভাবে তুলে ধরেছেন-

ইসলামি মৌলবাদ পশ্চিমাদের জন্য মূল সমস্যা নয়; বরং সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন সভ্যতার ধারক হওয়ার কারণে খোদ ইসলামই তাদের মূল সমস্যা। কারণ, এ ধর্মের অনুসারীরা তাদের নিজেদের জীবনাচার ও ইসলামের সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে; যদিও নিজেদের শক্তি সামর্থ্যের দীনতা বর্তমানে তাদের মনকে কিছুটা দুর্বল করে রেখেছে। একই ভাবে ইসরামের জন্য সিআইএ কিংবা আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কোনো সমস্যা নয়, বরং পুরো পশ্চিমা সভ্যতাই তাদের জন্য একটি বড় সমস্যা। কারণ, তারাও বিশ্বাস করে যে, তাদের জীবনধারা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশ্বজনীন। এমনকি তারা এ-ও বিশ্বাস করে যে, শক্তি প্রয়োগ করে হলেও গোটা বিশ্বের মানুষকে আমাদের সভ্যতা মেনে নিতে বাধ্য করা উচিত। ইসলাম এবং পশ্চিমা বিশ্বের এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের পেছনের এটাই হলো মূল কারণ।

নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার একটি প্রবন্ধে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

বিশ্বশান্তি এবং নিরাপত্তার প্রধান হুমকি হিসেবে দৃশ্যপটে মুসলিম মৌলবাদকে আবির্ভূত হচ্ছে বেপরোয়াভাবো। শুধু তাই নয়, বরং তা জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে নানা প্রকার গোলযোগ সৃষ্টি করছে। ১৯৩০ এর দশকে নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদ এবং পরবর্তীকালে পঞ্চাশের দশকে সমাজতন্ত্র যে ভীতিকর অবস্থার জন্ম দিয়েছিল, ইসলামি মৌলবাদের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে।

তবে অধ্যাপক হান্টিংটন এসব দাবিকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়ে গোটা ইসলামকেই পশ্চিমাদের জন্য সমস্যার মূল কারণ চিহ্নিত করেছেন। কেননা ইসলামি সভ্যতা মৌলিকভাবে পশ্চিমা সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রধর্মী।

ইসলামি সভ্যতায় জ্ঞান চর্চা

আজ পর্যন্ত কুরআনের কোনো জ্ঞানের সাথে বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের কোনো বিরোধ দেখা দেয়নি। কারণ বিজ্ঞান সৃষ্টিজগতের যে জ্ঞান সংগ্রহ করে তা যে আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, কুরআনও ঐ একই উৎস থেকে এসেছে। কুরআনের মতো কোনো বিশুদ্ধ সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে জ্ঞান পাশ্চাত্য সভ্যতার হাতে নেই। বিশ্বে মুসলিম শাসনামলে কুরআনই বিজ্ঞান চর্চার প্রেরণা জুগিয়েছে। বর্তমানে মুসলিম জাতি কুরআনের জ্ঞান চর্চা না করায় পাশ্চাত্যের দুয়ারে জ্ঞানের ভিক্ষা চেয়ে বেড়াচ্ছে।

একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানই নির্ভুল ও বিশুদ্ধ। বিশুদ্ধ জ্ঞান চিরন্তন সত্য। বিশুদ্ধ জ্ঞান এক সময় আবার অশুদ্ধ হয়ে যায় না। তাই আল্লাহর দেওয়া নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে মানবজীবন পরিচালিত হলে কোনো সময়ই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে না। মানুষের মেধা, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা যদি আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানকে অবলম্বন করে, তাহলে তারা যত জ্ঞান আহরণ করবে সবই বিশুদ্ধ ও নির্ভুল হবে। কিন্তু আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানকে বাদ দিয়ে মানুষ যত জ্ঞান-ই চর্চা করুক না কেন তাতে নির্ভুল জ্ঞানের নিশ্চয়তা নেই।

ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি

ইসলামি সভ্যতার ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামের ঘোষণা হলো, মানবজাতি ও গোটা বিশ্বজগৎ সুপরিকল্পিতভাবে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন।

ইসলাম শুধু কতক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম নয়। আল্লাহ তাআলা নবি ও রাসুল পাঠিয়ে মানুষকে পৃথিবীতে জীবন যাপনের জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞান দান করেছেন। ঐসব জ্ঞানের সমষ্টিই হলো- দীনন ইসলাম ও ইসলামি জীবনবিধান। মানুষ তার দৈহিক ও মানসিক শক্তি কীভাবে ব্যবহার করবে, তাদের পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামষ্টিক জীবন কীভাবো পরিচালননা করলে দুনিয়ায় মানুষ শাস্তিতে বসবাস করতে পারবে এবং অশান্তি, বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা পাবে, সে বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া হাআলা নবী রাসুলগণকে যে জ্ঞান দান করে পাঠিয়েছেন সেসবের সামষ্টিক নাম ই ইসলাম।

পাশ্চাত্য সভ্যতা আল্লাহর হেদায়াতের কোনো প্রয়োজন বোধ করে না। ধর্মের নামে চার্চের অন্যায় ও জুলুমের দীর্ঘ তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে তারা তাদের পড়কে চার্চে বন্দি করে রেখেছে এবং চার্চের বাইরে আসার উপর ১৪৪ ধারার মতো নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তাই তারা গড থেকে কোন পথনির্দেশ নিতে ব্যক্তি নয়। তাদের কাছে গড এর বাণী হিসেবে যে বাইবেল রয়েছে, তা তো মানব রচিত গ্রন্থ। ইনজিল কিতাব যে ভাষায় নাযিল হয়েছিল বর্তামনে তার তো কোনো অস্তিত্ব নেই; তাহলে গড-এর পথনির্দেশ তারা কোথায় পাবে? তাই পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিমূলেই বিশ্বস্রষ্টার কোনো অবস্থান নেই।

আজ পর্যন্ত কুরআনের কোনো জ্ঞানের সাথে বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের কোনো বিরোধ দেখা দেয়নি। কারণ, বিজ্ঞান সৃষ্টিজগতের যে জ্ঞান সঙগ্রহ করে তা যে আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, কুরআনও ঐ একই উৎস থেকে এসেছে। কুরআনের মতো কোনো বিশুদ্ধ সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে জ্ঞান পাশ্চাত্য সভ্যতার হাতে নেই। বিশ্বে মুসলিম শাসনামলে কুরআনই বিজ্ঞান চর্চার প্রেরণা জুগিয়েছে। বর্তমানে

মুসলিম জাতি কুরআনের জ্ঞান চর্চা না করায় পশ্চাত্যের দুয়ারে জ্ঞানে ভিক্ষা চেয়ে বেড়াচ্ছে।

অধ্যায় ৫

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব

ইসলামি সভ্যতার প্রধান ভিত্তিসমূহের একটি হলো, আখিরাতের জবাবদিহিতা। মানুষ দুনিয়ার যা কিছু করে এর নৈতিক ফল মৃত্যু পরবর্তী জীবনে পাওয়া যাবে। এ বিশ্বাস ছাড়া কারও পক্ষেই নৈতিক মান রক্ষা করে নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন সম্ভব নয়।
ইসলামে Honesty is a value আর পাশ্চাত্য সভ্যতায় Honesty is a policy অর্থাৎ ইসলামের মতে সর্বাবস্থায় সততা অবলম্বন করতে হবে। আর পাশ্চাত্য সভ্যতায় নীতি হিসেবে সততাকে লাভজনক বলে গ্রহণ করা হয়। ব্যবসায়ে উন্নতির স্বার্থে সততা প্রয়োজন। কিন্তু যদি ধরা পড়ার আশঙ্কা না থাকে তাহলে সততা জরুরি নয়।

অসৎ উপায়ে উন্নতি করতে বাধা নেই, যদি আইনকে ফাঁকি দেওয়া যায়। আইন, পুলিশ ও লোকলজ্জার ভয়ে সততা পালন করা হয়ে থাকে। ইসলাম অনুযায়ী আল্লাহর ভয়ে সৎ থাকতে হবে, যাতে আখিরাতে শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কারণ আইন ও পুলিশ নাগাল না পেলেও এবং অন্য কোনো মানুষ না দেখলেও আল্লাহ সর্বাবস্থায় দেখছেন। তাকে ফাকি দেওয়ার কারও কোনো সুযোগ নেই- এ বিশ্বাস নৈতিকতা মেনে চলে বাধ্য করে। কুরআনে বলা হয়েছে- আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের জবাবদিহিতার চেতনা ছাড়াও কোনো মানুষ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে পারে না। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চেতনার ধারই ধারে না।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, ইসলামি সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিগত দূরত্ব বিরাট। ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি হলো- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ, যা থেকে তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, জান্নাত- জাহান্নাম, কিয়ামত ও বিচার দিবসের বিশ্বাসের কথা আসে। আর পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি হলো, সেক্যুলারিজম, ডেমোক্রেসি, ডারউইনিজম, মেটেরিয়ালিজম ইত্যাদি। এসব মৌলিক ভিত্তির দিক দিয়ে ইসলামি সভ্যতার সম্পূর্ণ বিপরীত হলো পাশ্চাত্য সভ্যতা।

ইসলামি সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্বের কারন

সমস্যার মূল কারণ চিহ্নিত করতে গিয়ে অধ্যাপক হান্টিংটন বলেন, মুসলিম বিশ্ব প্রধান যে সমস্যা মোকাবিলা করছে, তা হলো- স্বয়ং পশ্চিমা সভ্যতা। এটা নিছক সিআইএ,র ষড়যন্ত্র বা আমেরিকান সেনাবাহিনীর দখলদারিত্বের বিষয় নয়। তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেন, এ সমস্যার মূলে রয়েছে পশ্চিমা সভ্যতা কর্তৃক নিজেদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও জীবনধারাকে অন্য যেকোনো সংস্কৃতির চেয়ে উন্নতর মনে করা। পশ্চিমারা মনে করেন, অন্য সকলের উচিত আমাদের সভ্যতা মেনে নেওয়া, আমারে রীতি নীতি অনুসরণ করা এবং সে হিসেবে জীবনযাপন করা। তাদের এই বিশ্বাসের পেছনে মূল কারণ হলো, ডারউইনিজম। এ তত্ত্ব অনুযায়ী বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানবজাতির উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং একটি ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে মানবসমাজ এগিয়ে যেতে থাকে। এই তত্ত্ব অনুসারে, মানুষের কল্পিত পূর্বপুরুষ বানর থেকে সূচনা করে এই একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মানবসমাজের ধারাবাহিকতায় অগ্রগতি হয়ে আসছে। গত কয়েক শতক জুড়ে বিবর্তন তত্ত্বের যোগ্যরাই টিকে থাকে শীর্ষক নীতির ভিত্তিতে পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে মানবসভ্যতার শীর্ষস্থানটি দেওয়া হয়েছে। আর এর ভিত্তিতেই তারা দাবি করে যে, তাদের সভ্যতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে গোটা মানবজাতির মুক্তি। অধ্যাপক হান্টিংটন আরও একধাপ এগিয়ে যে বাস্তবতাটি তুলে ধরেছেন তা হলো- পশ্চিমারা নিজেদের জীবনব্যবস্থাকে অন্য সকলের জন্য কেবল যথাযথেই মনে করে না, বরং অন্যদের তাদের সংস্কৃতি মেনে নিতে বাধ্য করাকেও তারা একটি তাদের একটি নৈতিক দায়িত্ব মনে করে। আর সে দায়িত্ব পালনের জন্য রাজনিতক, কুটনৈতিক কিংবা সামরিক পন্থাও অবলম্বন করা যেতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করে। তিনি এর পেছনে দুটি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন, যাকে তিনি এই দ্বন্দ্বের অন্যতম চালিকাশক্তি বলে মনে করেন।

১। মুসলমানরা নিজেদের সংস্কৃতিকে অন্য যেকোনো সংস্কৃতি থেকে শ্রেষ্ঠতর ও মর্যাদাকর বলে মনে করে। অধিকাংশ মুসলিম গর্বভরে দাবি করে যে, তাদের ধর্ম ইসলাম অন্য যেকোন ধর্ম বা দর্শন থেকে শ্রেষ্ঠ। ইসলামি জীবনব্যবস্থা বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ- এই বিশ্বাসের স্বাভাবিক দাবি হিসেবে তাদের মধ্যে এ ধরনের আত্মবিশ্বাসী মনোভাব জন্ম নিয়েছে। আর এটা মনে করা

তো আসলেই যুক্তিসংগত যে, মহান আল্লাহর প্রেরিত ধর্মের অনুশীলন যে সংস্কৃতির জন্ম দেয়, নিঃসন্দেহে তা মানুষের গবেষণা, আন্দাজ অনুমানভিত্তিক সভ্যতা সংস্কৃতি থেকে শ্রেষ্ঠতর হবে।

২। মুসলমানদের মনে তাদের দেশে ইসলামি আইন বা শরিয়াহ বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষা। আলজেরিয়া, মিসর, চেচনিয়া, বোসনিয়া, দাগেস্তান, তিউনিশিয়া, লিবিয়া, সিরায়সহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে যে অস্থিতিশীলতা বর্তমানে বিরাজমান তা এই স্পৃহারই বহিঃপ্রকাশ ।

বর্তমানে বেশিরভাগ মুসলিম দেশের সরকার ব্রিটিশ, ফরাসি, জার্মান এবং ডাচ আইন দ্বারা দেশ শাসন করছে, আর ইসলামি আইনগুলোকে কেবল পারিবারিক জীবনের মাঝে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে।

মুসলিম দেশ গুলো কেনো পাশ্চ্যত্য সভ্যতা কে গ্রহন করছে?

আল্লাহর রাসূলের একটি হাদিস থেকে জানা যায় যে, কোনো এক সময় মানুষ মদিনার প্রতি অনাগ্রহী হয়ে উঠবে এবং জেরুযালেমের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করবে। অর্থ্যাৎ তাদের গলামি করা শুরু করবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই গোলামির কারণ কী? এর বিস্তারিত ব্যাখা করতে হলে একটি আলাদা গ্রন্থই রচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তবে সংক্ষেপে বললে তা নিম্নরুপ দাঁড়ায়-
মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাধান্যের ভিত্তি স্থাপিত হয় চিন্তা-গবেষণা ও জ্ঞান সাধনার উপর। যে জাতি এ পথে অগ্রগামী, সে-ই দুনিয়া নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসন অলংকৃত করে। তার চিন্তাধারাই গোটা দুনিয়াকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। পক্ষান্তরে যে জাতি এ ক্ষেত্রে পেছনে পড়ে থাকে, তাকে স্বভাবতই অন্যের অনুবর্তী ও অনুসারী হয়ে থাকতে হয়। তার চিন্তাধারা ও মতাদর্শে লোকদের মস্তিষ্কের উপর আধিপত্য বিস্তার করার মতো কোনো শক্তিই বাকি থাকে না। জ্ঞানসাধক ও সত্যানুসন্ধিৎসু জাতির শক্তিশালী চিন্তা ও মতবিশ্বাসের বন্যা-প্রবাহ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নিজের জায়গায় দাড়িয়ে থাকার মতো শক্তি-সামর্থ্য পর্যন্ত তার মধ্যে থাকে না। মুসলমানরা যত দিন

সত্যানুসন্ধিৎসা ও জ্ঞান সাধনার পথে অগ্রসর ছিল, তত দিন দুনিয়ার সকল জাতি তাদের অনুসরণ ও অনুবর্তন করে চলছে। ইসলামি চিন্তাধারা সমগ্র মানবজাতির চিন্তা দর্শনকে আচ্ছন্ন করেছিল। ভালো-মন্দ, সুকৃতি-দৃষ্কৃতি, ভ্রান্তি-অভ্রান্তি সর্ম্পকে ইসলামের নির্ধারিত মানদন্ড-সজ্ঞানে হোক আর অজ্ঞানে, সমগ্র দুনিয়ার কাছে একমাত্র মানদন্ড হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। আর দুনিয়ার লোকেরা কি ইচ্ছায়, কি অনিচ্ছায় তাদের চিন্তাধারা ও কর্মকান্ডকে সেই মানদন্ডের আদলেই গড়ে তুলেছিল। কিন্তু মুলমানদের মধ্যে চিন্তাধারক ও গবেষকের আবির্ভাব যখন বন্ধ হয়ে গেল, তারা ত্যাগ করল চিন্তা-ভাবনা ও সত্যানুসন্ধিৎসা এবং জ্ঞান-সাধনা ও চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তখন তারা দুনিয়ার নেতৃত্ব থেকেই যেন অবসর গ্রহণ করল। অন্যদিকে পাশ্চাত্য জাতিগুলো এইসকল ক্ষেত্রেই দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল। তারা চিন্তা-গবেষণার শক্তিকে কাজে লাগাল; বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তিগুলোর উৎস সন্ধান করল। এর অনিবার্য পরিণতি যা হওয়ার তা-ই হলো। পাশ্চাত্য জাতিগুলো দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসন দখল করে বসল। একসময় যেভাবে দুনিয়ার লোকেরা মুসলমানদের কর্তৃত্বের সামনে নতি স্বীকার করেছিল, তেমনি তাদেরও পাশ্চাত্য জাতিগুলোর কর্তৃত্ব মেনে নিতে হলো।

বর্তমানে মুসলমান এই দ্বিবিধ গোলামিরই শিকার। কোথাও উভয়বিধ গোলামি পুরোপুরি বর্তমান, আবার কোথাও রাজনৈতিক গোলামি কিছুটা কম হলেও মানসিক গোলামি সমধিক। দুভার্গ্যবশত বর্তমানে কোনো মুসলিম জনপদই সত্যিকারভাবে রাজনৈতিক ও মানসিক দিক দিয়ে পুরোপুরি স্বাধীন নয়। কোথাও তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ভোগ করলেও নৈতিক ও মানসিক গোলামি থেকে আদৌ মুক্ত নয়। তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, হাট বাজার, সভা সমিতি, ঘরবাড়ি, এমনকি তাদের আপন দেহ পর্যন্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতি, চিন্তা ধারার ও জ্ঞান বিজ্ঞান তাদের উপর পুরোমাত্রায় কর্তৃত্বশীল। তারা পাশ্চাত্যের মগজ দিয়ে চিন্তা করে, পাশ্চাত্যের চোখ দিয়ে দেখে, পাশ্চাত্যের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে চলে। তারা উপলব্ধি করুক আর না করুক, তাদের মগজের উপর এই ধারণাই চেপে রয়েছে যে, পাশ্চাত্য যাকে সত্য মনে করে, তা-ই সত্য, আর সে যা মিথ্যা ঘোষণা করছে, তা-ই মিথ্যা। তাদের মতে সত্যতা, যথার্থতা, সভ্যতা,

নৈতিকতা, ভদ্রতা, শালীনতা ইত্যাদি ব্যাপারে পাশ্চাত্যের নির্ধারিত মানদন্ডই হচ্ছে একমাত্র নির্ভুল মানদন্ড।

অধ্যায় ৬

সভ্যতা অনুসরন

আমি কেন ইসলামি সভ্যতা গ্রহন করবো?

ইসলামি সভ্যতা গ্রহন না করা মানে হলো পাশ্চাত্যতাকে গ্রহন করা তার মানে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের বিরুদ্ধে অথ্যাৎ আল্লাহর বিরোধী শক্তিকে গ্রহন করা।ইতিহাস দেখলে জানা যায়, যুগে যুগে যারাই ইসলামের বিরুদ্ধে ছিলো তারাই শেষ হয়ে গিয়েছে।আল্লাহ তাদের কে এমন ভাবে গায়েল করেছে যে, তারা এখনো ইতিহাসে খাতায় নিকৃষ্টভাবে পরিচয় লাভ করেছে।ইতিহাস ও পূর্ববর্তীদের কীর্তি ও পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা মুমিন মুসলমানের কর্তব্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

‘তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না এবং তাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল, তা কি দেখে না? যারা মুত্তাকি, তাদের জন্য পরলোকই শ্রেয়। তোমরা কি বোঝো না?’(সুরা-১২ ইউসুফ, আয়াত: ১০৯)

‘তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? তাহলে দেখত যে তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কীরূপ হয়েছিল। শক্তিতে তারা ছিল এদের অপেক্ষা প্রবল, তারা ভূমি চাষ করত, তারা তা আবাদ করত, এদের আবাদ করা অপেক্ষা অধিক।’ (সুরা-৩০ রুম, আয়াত: ৯)

‘তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না এবং দেখে না তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল? আল্লাহ তাদের ধ্বংস করেছেন এবং অকৃতজ্ঞ কাফিরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম।’ (সুরা-মুহাম্মদ)

যারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে না, তাদের পরিণতি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে,

‘তাদের যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা যখন তা বিস্মৃত হলো, তখন আমি তাদের জন্য সবকিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। অবশেষে তাদের যা দেওয়া হলো, যখন তাতে তারা উল্লসিত হলো, তখন হঠাৎ তাদের পাকড়াও করলাম। ফলে তখনই তারা নিরাশ হলো। অতঃপর জালিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হলো এবং সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক।’ (সুরা-৬ আনআম, আয়াত: ৪৪-৪৫)

সুতরাং পাশ্চাত্ত্যতার মাঝে কিছুই নেই নেয়ার মত, আছে শুধু ধ্বংস। যে জাতি এই সভ্যতাকে গ্রহন করবে এবং মনে করবে এর মধ্যেই সকল সফলতা নিহিত তারা ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত।তাই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা পেতে হলে ইসলামি সভ্যতাকে আকড়ে ধরতে হবে ঈমানের সাথে।